Vol. 26 | No. 1 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্যে প্রকৃতি

Volume	26
Issue	1
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনোয়ারা হোসেন
Published online	December 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v26i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i1.6
Pages	108-118
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্যে প্রকৃতি

মনোয়ারা হোসেন

রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবন কবির জীবনের শেষদশক, যা কালের দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশদশক। এ সময়ে সংগঠিত স্বদেশ ও বিশ্বের ঘটনাবলী কবির অভিজ্ঞতা ও চেতনাকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করেছে, যার সংগে উত্তরজীবনে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি ও প্রকৃতি-চেতনার সম্পর্ক বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের অর্থাৎ জীবনের শেষ দশ বছরের কাব্য 'পুনশ্চ' থেকে 'শেষলেখা' (সময় বাং ১৩৩৯-১৩৪৮ ; ইং ১৯৩২-১৯৪১ খৃ.)। এ পর্যায়ে প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভংগীর স্বরূপ বিশ্লেষণ আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় দৃশ্যবর্ণনার প্রাচুর্য, 'পুনশ্চ'-পূর্ব কাব্যে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর-পূর্ববঙ্গের নিসর্গ ; আলোচ্য পর্যায়ে প্রাধান্য রাঢ় অঞ্চলের। এ পর্বে প্রকৃতির দৃশ্যপট অংকনে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শঃই বর্তমান থেকে অতীতে বা সরাসরি অতীতে চলে গিয়েছেন। 'পুনশ্চ'-পূর্ব কাব্যে বর্ষা বা বসন্ত বর্ণনায় কল্পনায় স্থান পেয়েছে প্রাচীন ভারত——কালিদাসের কাল অর্থাৎ দূর অতীত। উত্তর-কাব্যে প্রধানতঃ তা বর্তমানকালের পরিচিত জনপদেই সীমাবদ্ধ। আলোচ্য পর্যায়ে যখনই তিনি অতীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন তা মূলতঃই নিকট অতীতের স্মৃতি-চারণের জন্য ; যেমন 'পুনশ্চ' কাব্যের "বিচ্ছেদ" কবিতাটি। উত্তর-কাব্যের প্রকৃতি বর্ণনার এক প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে বালক রবীন্দ্রনাথের বোলপুর প্রকৃতির স্মৃতি। বোলপুরের খোয়াই বর্ণনায় কবি উল্লেখ করেছেন—

এসেছিলেম বালক কালে।
ওখানে গুহা গহ্বরে
ঝির্‌ঝির্ ঝর্ণার ধারায়
রচনা করেছি মনগড়া রহস্য কথা,
খেলেছি নুড়ি সাজিয়ে
নির্জন দুপুরবেলায় আপন-মনে একলা।

[খোয়াই / 'পুনশ্চ']

উল্লিখিত কবিতার প্রতিচিত্র পাই 'জীবনস্মৃতি'তে——

> খোয়াইর মধ্যে একজায়গায় মাটি চুঁইয়া একটা গভীর গর্তের মধ্যে জল জমা হইত। এই জলসঞ্চয় আপন বেষ্টন ছাপাইয়া ঝির্‌ঝির্ করিয়া বালির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।

"বালক" কবিতায় বন-বাদাড়, খাল, বিল, নদীর ধার, পোড়ো জমি, ডুবো নৌকো, ভাঙা মন্দির, তেঁতুল গাছের সবার উঁচু ডালটা আর জামবাগানের তলায় চরে বেড়ানো

ধোবাদের গাধার সর্বস্বত্বাধিকারী মা-মরা বালকের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি চলে গিয়েছেন শৈশবে যেখানে,

> শান-বাঁধানো মেজে, খড়খড়ে-দেওয়া জানলা।
> নীচে ঘাট বাঁধানো পুকুর, পাঁচিল ঘেঁষে নারকেল গাছ।
> জটাধারী বুড়ো বট মোটা মোটা শিকড়ে
> আঁকড়ে ধরেছে পূব ধারটা।
>
> [বালক / 'পুনশ্চ']

এর সংগে তুলনীয়——

> জানালার নীচেই একটি ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণ ধারে নারিকেল শ্রেণী।···বটগাছের গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলো ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল।
>
> [জীবনস্মৃতি / 'র-র ১৭']

এভাবে পর্যালোচনা করলে 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লিখিত অনেক ঘটনার প্রতিচিত্র পাওয়া যাবে শেষপর্যায়ের কাব্যগুলিতে। প্রকৃতির বিশেষক্ষণের আবহসৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ উত্তরকাব্যে কোন কোন কবিতায় ব্যক্তির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন, যেমন——

> রাত দুটোর সময় স্বরূপ সর্দার নিষুতরাতে
> বারান্দায় বারান্দায় হাঁক দিয়ে যায় চলে।
>
> [বালক / 'পুনশ্চ']

মনে হয় ছেলেবেলায় যে সব চিত্র কবির অবচেতন মনে গেঁথে ছিল প্রৌঢ় বয়সের কবিতায় সে সব ছবি ভেসে উঠেছে। একই চিত্র, একই প্রহর, একই নাম 'জীবনস্মৃতি'তেও রয়েছে, যেমন——

> অধরাত্রে কোনো কোনো দিন আধঘুমে শুনিতে পাইতাম, অতিবৃদ্ধ স্বরূপ সর্দার কোথায় হাঁক দিতে দিতে এক বারান্দা হইতে আরেক বারান্দায় চলিয়া যাইতেছে।

স্মৃতিনির্ভর প্রকৃতিচিত্রণ উত্তর-কাব্যের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কিন্তু প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। এ পর্বে নিকট অতীত আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী আছে বর্তমান এবং তা তার বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে নয়। এ পর্যায়ের প্রকৃতিবর্ণনার এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে নগরের জীবন ও পরিবেশ যা পূর্বকাব্যে প্রায় অনুপস্থিত। শহরের ক্লাবের ধোঁয়াটে পরিবেশে ধাতব ট্রামের শব্দ আর যান্ত্রিক গ্রামোফোনের গান (একত্রিশ/ 'শেষ-সপ্তক'), বেআইনি চালে ট্যাকসি ছোটা এবং ট্রেন ছাড়ার ন' মিনিট বাকি সংবাদে (অপরপক্ষ/ 'শ্যামলী') নগর প্রকৃতির গতি ও ব্যস্ততার প্রকাশ ঘটেছে। হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড, হাওড়া ব্রিজ (অপরপক্ষ / 'শ্যামলী'), আনন্দবাজার পত্রিকা, বন্দেমাতরম্ পেড়ে শাড়ি, খেলার ট্রাইসিকেল, হাজরা রোডের মোড় (এপারে ওপারে/ 'নবজাতক') ওডিকোলন, এমোনিয়া (বাসাবদল / 'সানাই')—এ সবের মধ্যে নগর প্রকৃতির বাস্তবতা প্রকাশিত। নগরের উজ্জ্বল রাজপথের পেছনে যে অলি-গলি তার পরিবেশ এখানে উপেক্ষিত হয়নি, যেমন——

খোলা জানালার সামনে দেখা যায় গলি,
একটা হলদে গ্যাসের আলোর খুঁটি
দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো।

[বত্রিশ/'শেষ সপ্তক']

অথবা

কিনু গোয়ালার গলি।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পঁচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি
মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে!

[বাঁশি / 'পুনশ্চ']

কিনু গোয়ালার গলি বা অন্য যে কোন গলি হোকনা কেন, দৃশ্য সেখানে এক, গলির কোণে কোণে জমে ওঠা আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি, মাছের কানকা, মরা বেড়ালের ছানা অর্থাৎ পচনশীল প্রকৃতি সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে উজ্জীবিত। এ পর্যায়ে নগর প্রকৃতি গন্ধ ও শব্দময়---কাঁঠালের ভূতি পচা আমানি, মাছের আঁশ, মরা বেড়ালের দেহ আর পেঁকো নর্দমায় বীভৎস মাছির দলের ঐকতান যার উপাদান (অনসূয়া / 'সানাই')।

উত্তর-কাব্যের নগর প্রকৃতিতে যান্ত্রিক সভ্যতায় স্বাভাবিক পরিবেশের বিনষ্টি এবং নগরায়ণে সহজ প্রাণ প্রবাহের স্তব্ধতা ধরা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যে মৃত্তিকা থেকে সহজ প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ কবিকে তা আকর্ষণ করেছে, যেমন---

চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
পদ্মার ভাঙন লাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউ বনে
গাঙ শালিকের হাজার খোপের বাসায়।
আমার দু-চোখ ভ'রে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে
শীতের ঘু ঘু ডাকা দুপুর বেলায়
রাঙা পথের ওপারে,

এ মাটির ডাক কেবল পূর্বজীবনের পদ্মাপারের স্মৃতি নয়, উত্তর-জীবনে কবির মর্ত্যপ্রীতি মৃত্তিকা প্রীতির বিশেষ রূপ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন অর্থাৎ সামান্য ও সাধারণের প্রতি আকর্ষণ এ পর্যায়ের কাব্যকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছে। তাই দেশী অশথ, বট বা বিদেশী গাছের সাথে স্থান পেয়েছে সাহিত্যে অনাদৃত আমড়া; করমচা, চালতা, পেঁপে, হর্তকি---এমন কি মনসার ঝোঁপ, কলমিশাক, আগাছা, দাম বা শ্যাওলা পর্যন্ত, যেমন---

দেখা যায়, ঝিল্‌মিল্ করছে
ঢালু পাড়ির তলায়

দিঘির উত্তর ধারের এক টুকরো জল
কলমি শাকের পাড়-দেওয়া।
[অমৃত / 'শ্যামলী']

অথবা

আগাছায় পথ রুদ্ধ, আঙিনায় মনসার ঝোঁপ,
তুলসীর মঞ্চখানি হয়ে গেছে লোপ।
[পোড়োবাড়ি / 'বীথিকা']

অথবা

লোভ হয় জলের ঝিলমিলি দেখে।
তলায় পাতা ছড়িয়ে শেওলাগুলো দুলতে থাকে
মাছগুলো খেলা করে।
[ছেলেটা / 'পুনশ্চ']

অন্যদিকে দেশী বিদেশী গন্ধরাজ, টগর, রজনী-গন্ধা, ম্যাগনোলিয়া প্রভৃতি ফুলের আভিজাত্যে বৈচিত্র্য এনেছে ভাঁটিফুল, কাশফুল, শণের ফুল, কুড়চি, বিভিন্ন সব্জী, ফল গাছের ফুল আর মঞ্জরী—মহানিম, তেঁতুল, সেগুন বা সজনের। বন্যফুলও আদৃত হয়েছে নামকরণের মাধ্যমে (সময়হারা/'আকাশ প্রদীপ')। যে ফুলের নামকরণ সম্ভব হয়নি সেগুলি অজানা ফুল, (অসম্ভব ছবি / 'সানাই'), চোখে না দেখার ফুল (স্কুল পালানো/ 'আকাশ প্রদীপ') বলে গৃহীত হয়েছে / অনাদৃত প্রাণী বা কীটপতঙ্গ এ পর্যায়ে উপেক্ষিত নয়, যেমন—

চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর
ভিড় করে মাছি।
[৪ / 'আরোগ্য']

অথবা

একদিকে কামিনীর ডালে
মাকড়সা শিশিরের ঝালর দুলিয়েছে,
[কীটের সংসার / 'পুনশ্চ']

অথবা

একদিকে বাগানে রাস্তার ধারে
লালমাটির কনা-ছড়ানো
পিঁপড়ের বাসা।
[কীটের সংসার / 'পুনশ্চ']

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ক্ষতবিক্ষত কুকুর, বাছুর, বাঁদর, ছাগল ছানা থেকে শুরু করে রোদ পোহানো কচ্ছপ, (ঝড় / 'ছড়ার ছবি') গুগলি তোলায় ব্যস্ত পাতি হাঁস (ছেলেটা / 'পুনশ্চ') ঝগড়াটে শালিক, গিরগিটি, কাঠবিড়ালি, বেজি, ঝিঁঝিঁ পোকা পর্যন্ত এ পর্যায়ে স্থান করে নিয়েছে। 'পুনশ্চ'-পূর্ব কাব্যের মতো এ পর্বেও কোকিলের

বিশেষ স্থান থাকলেও কোকিলের ভাঙা গলা অবশ্যই অভিনব যা বাস্তবতারও পরিচায়ক। কোকিলের পরে এ পর্বে কাকের স্থান যা রূঢ় পরিবেশের বাস্তবতাকেও বহন করে—

কাকগুলো পড়েছে মুখ থবড়িয়ে মাটিতে
ঠোঁট দিয়ে বাসা ধরেছে কামড়িয়ে,
ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছে সরে সরে।
ঝট্ পট্ করছে পাখাদুটো।
[নয় / 'পত্র পুট']

অথবা

চালতা গাছের তলায়
উচ্ছিষ্ট আমের আঁঠি নিয়ে
টানাটানি করছিল একটা কাক।
[অকাল ঘুম / 'শ্যামলী']

উত্তর কাব্যে প্রকৃতি দৃশ্যপটরূপে ব্যবহৃত হয়েছে কিছুটা ভিন্নভাবে, যেমন—

ভাদ্র মাসের কানায় কানায় জল
জলে গাছের ছায়া টল্‌টল্ করছে
সবুজ রেশমের আভায়

তীরে তীরে কলমি শাক আর হেলঞ্চ
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছকটা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
এ ধারের ডাঙায় কবরী, সাদা রঙন, একটি শিউলি
দুটি অযত্নের রজনী-গন্ধার ফুল ধরেছে গরিবের মতো
বাখারি বাঁধা মেহেদির বেড়া
তার ওপারে কলা পেয়ারা নারকেলের বাগান।
[পুকুরধারে / 'পুনশ্চ']

অথবা

শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে
চরে বেড়ায় দুটি চারটি গোরু,
নিরুৎসুক আলস্যে,
লেজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়িয়ে,
[চুয়াল্লিশ / 'শেষ সপ্তক']

এখানে প্রকৃতির ছবি প্রায় আলোকচিত্রের মতো—যেখানে কবির দৃষ্টি এড়ায়নি তুচ্ছ কলমি শাক আর হেলঞ্চ, যেখানে তিনি লক্ষ্য করেছেন পড়ন্ত বিকেলের দুটি অযত্নের রজনীগন্ধার অপ্রাচুর্য; বিষয় বিতৃষ্ণ বৈরাগীর দৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি সাদা রঙন কিংবা একটি শিউলি। শুকনোঘাসের হলদে মাঠে চরা গোরুকে লক্ষ্য করতে গিয়ে তিনি লেজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়ানোটুকুও প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব বিভিন্ন দৃশ্যপটে বিধৃত বর্ণনায় কবি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির পারচয় দিয়েছেন যার পরিচয় শেষ পর্যায়ে কাব্যের সর্বত্রই পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবর্ণনা গন্ধে, স্পর্শে, ধ্বনিতে শব্দ ও গতিময়। বিচিত্র ধ্বনি বা গন্ধের ব্যবহার রবীন্দ্রকাব্যে নতুন নয় কিন্তু বিভিন্ন পশুপাখীর ধ্বনি, যানবাহনের ধ্বনি, প্রহরের ধ্বনি অভিনব, যেমন—

শ্রাবণ মাসের রৌদ্র দেখা দিয়েছে
অনাহূত অতিথি
হাসির কোলাহল উঠল
গাছে গাছে ডালে-পালায়।
[দেখা / 'পুনশ্চ']

অথবা

পাট-বোঝাই মোষের গাড়ি
চাকার ক্লিষ্টশব্দে মুচড়ে দিচ্ছিল বাতাস।
[অকাল ঘুম / 'শ্যামলী']

অথবা

বীভৎস মাছির দল ঐকতান-বাদন বাজায়।
[অনসূয়া / 'সানাই']

অন্যদিকে তারাঝরা ফুল, তেঁতুলের মঞ্জরী, ভাঁটিফুল বা শুকনো ঘাসের গন্ধে বিশেষত্ব আছে। উপরন্তু ধানপচানির গন্ধে, পানাপুকুর বা শ্যাওলার গন্ধে উপলব্ধি করা যায় যে রবীন্দ্রচেতনা 'পুনশ্চ'-পূর্ব কাব্য অপেক্ষা 'পুনশ্চ'-পরবর্তী কাব্যে তুলনামূলকভাবে অধিকতর সর্বত্রগামী। যেমন,

ধান-পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষ।
[সানাই / 'সানাই']

অথবা

যেতে যেতে পথ পাশে
পানাপুকুরের গন্ধ আসে,
[ঘরছাড়া / 'সেজুতি']

অথবা

ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধ গন্ধ।
[চার / 'শেষ সপ্তক']

এ পর্যায়ে প্রকৃতিচিত্রণ সহজ তাই তা তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত নয় বরং চারিদিকের দৃশ্যপটে বিস্তৃত যা বৈচিত্র্যময় এবং সমগ্র। যেমন—

হাটের দিন,
মাঠের মাঝখানের পথে
চলেছে গোরুর গাড়ি।

কলসীতে নতুন আখের গুড়, চালের বস্তা,
গ্রামের মেয়ে কাঁখের ঝুড়িতে নিয়েছে
কচুশাক, কাঁচাআম, শজনে ডাঁটা।

ছটা বাজল ইস্কুলের ঘড়িতে।
আমার ছোটো বাগানের পাঁচিলের গায়ে
বসেছি চৌকি টেনে
করবী গাছের তলায়।

... ...

কাঁকর-ঢালা পথের ধারে
বিলিতি মৌসুমি চারায়
ফুলগুলি রং হারিয়ে সংকুচিত।
হাওয়া দিয়েছে পশ্চিম দিক থেকে——
সাতটা বাজল ঘড়িতে।
ছড়িয়ে-পড়া মেঘগুলি গেছে মিলিয়ে।
সূর্য উঠল প্রাচীরের উপরে,
ছোটো হয়ে গেল গাছের যত ছায়া।
খিড়কির দরজা দিয়ে
মেয়েটি ঢুকল বাগানে।
পিঠে দুলছে ঝালরওয়ালা বেণী।
হাতে কঞ্চির ছড়ি।
চরাতে এনেছে
একজোড়া রাজহাঁস।
আর তার ছোটো ছোটো ছানাগুলিকে।
[এগারো / 'শেষ সপ্তক']

উদ্ধৃত কবিতাটিতে একটি গ্রামীণ সকালের বর্ণনা—যার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সহজ, সাধারণের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে তার বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির। কিন্তু কবিতাটির আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গ্রামীণ সকালের বর্ণনায় যে চিত্রগুলি পর পর এসেছে তাতে এক একটি চিত্র সময়কে এগিয়ে নিয়ে গেছে এক এক প্রহরে, যার নির্দেশ ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার শব্দে পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যই সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া আটপৌরে শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে সহজ ঐকান্তিকতা ও নৈকট্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। এ ধরনের শব্দ ব্যবহার উত্তর-কাব্যে অপ্রচুর নয়।

উত্তর-কাব্যে প্রকৃতিচিত্রণ সময়ের সুনির্দিষ্টতায় অভিনবত্ব লাভ করেছে। পূর্বে সময়ের এমন নির্দেশ খুব নেই। যেমন "স্বরূপসর্দার নিষুতরাতে বারান্দায় হাঁক দিয়ে যায়" আর এই নিষুত রাত হচ্ছে——'রাত দুটার সময়' (বালক / 'পুনশ্চ'), "উপুড় করা একটা উচ্ছিষ্ট অবকাশ খালি হয়ে যায়——রাত্তির দশটার পরে" (একত্রিশ / 'শেষ সপ্তক')। কখনো কখনো আবার সময় নির্দেশক ঘণ্টাধ্বনির উল্লেখও লক্ষণীয়। পাশের বাড়ীতে যখন অকারণে কুকুর ডেকে ওঠে দেউড়িতে তখন ন'টার ঘণ্টা বাজে (বত্রিশ/ 'শেষ সপ্তক')। শুধু সাতটা, ন'টা, দশটা, দুটো বা এগারোটা নয়, আড়াইটা, সাড়ে ছটা, সাড়ে দশটা—এমনি সুনির্দিষ্ট নির্দেশও দেখা যায় যা সময়ের বাস্তবতাকে আরো প্রখর

ও তীক্ষ্ণ করেছে, যেমন 'ভিজে বনের ঝলমলে মধ্যাহ্ন' যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি, বলা হয়েছে "বেলা এখন আড়াইটা" (সুন্দর / 'পুনশ্চ') এমনি—

মোটর গাড়ির চেনা শব্দ কখন দূরে মিলিয়ে গেছে সাড়ে-দশটা বেলায়।
[বাসাবদল / 'সানাই']

অথবা

প্রহরী-শালায় দূরে বাজে সাড়ে তিন
[ঘরছাড়া / 'সেঁজুতি']

প্রহরে প্রহরে প্রকৃতির যে রূপবদল সময়ের উল্লেখে তার প্রকাশ ছাড়াও দিন, মাস বা বৎসরের পরিধিতে প্রকৃতির যে পরিবর্তন তার প্রকাশ দেখি উত্তর-কাব্যে—

বেলা দুপুর
আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে।
... ...
বেলা যখন চারটে
বেহারা এসে খবর নেয়, চিটঠি ?
[ফাঁক / 'পুনশ্চ']

রাত্তির হয়ে আসে। শুতে যাই বিছানায়,
... ...
ভোরবেলায় ছুটেছি দক্ষিণের জানালায়,
বেলা বাড়ে।
... ...
সন্ধ্যে হয়ে এল
তারপরে কখন আসে ঘুম।
রাত দুটোর সময় স্বরূপ সর্দার নিষুতরাতে
বারান্দায় বারান্দায় হাঁক দিয়ে যায় চলে।
[বালক / 'পুনশ্চ']

প্রথম উদ্ধৃতিটিতে যে বর্ণনার শুরু বেলা দুপুরে তার শেষ হয় বেলা চারটায়। দ্বিতীয়-টিতে বালকের প্রাত্যহিক জীবনযাপন বর্ণিত হয়েছে প্রহর ধরে—রাত্তির, ভোরবেলা, সন্ধ্যে, নিষুত রাত। একটি রাত ও দিনের পরিধিতে প্রকৃতির বিবর্তনের মত একটি বর্ষের ক্রমিক বিবর্তন বর্ণিত হয়েছে কতকগুলো কবিতায় যেমন—

একদিন আষাঢ়ে নামল
বাঁশবনের মর্মর ঝোলা ডালে
জলভারে অভিভূত নীল মেঘের নিবিড় ছায়া

মাস যায়
বাতাসে থেমে গেল মত্ততার আন্দোলন,
শরতের শান্ত নির্মল আকাশ থেকে
... ...

মাস যায়।
নির্মম শীতের হাওয়া এসে পৌঁছল হিমাচল থেকে।
... ...
মাস যায়।
শূন্যমাঠে অতীতের চিহ্ন-গুলো
কিছুদিন রইল মৃত শিকড় আঁকড়ে ধরে—
... ...
মাস গেল।
তারপর মাঠের পথ দিয়ে
গোরু নিয়ে চলে রাখাল—
[চার / 'পত্রপুট']

উদ্ধৃত কবিতায় মাসের পর মাস চলে যাওয়ার বা ঋতুচক্রের পূর্ণ বিবর্তনের চিত্র আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসের, শরৎ বা শীত ঋতুর উল্লেখে বা অনুল্লেখে তুলে ধরা হয়েছে। ঋতু পরিক্রম রবীন্দ্রনাথে নতুন নয় কিন্তু ঋতুর দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর নতুন।

উত্তরকাব্যে সহজ সাধারণ প্রকৃতি——তার বৈচিত্র্য ও সমগ্রতাকে তুলে ধরে কবি বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তাই 'পুনশ্চ'-পূর্বকাব্যে খেত, পথ বা তরী জগৎ ও জীবনের বিশেষ তাৎপর্য বহন করলেও এ পর্যায়ে এসব প্রকৃতির সাধারণ উপাদান হিসেবেই ব্যবহৃত। যেমন —

হেথা-হোথা পলিমাটি স্তরে
পাড়ির নিচের তলে
ছোলা-খেত ভরেছে ফসলে।
[মানসী / 'সানাই']

অথবা

হেথা হোথা চরে গোরু শস্য শেষ বাজরার খেতে।
[৪ / 'আরোগ্য']

অথবা

যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে
শিমুলগাছের তলে কাঁকর বিছানো পথ বেয়ে
[সাঁওতাল মেয়ে / 'বীথিকা']

অথবা

বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙ্গি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।
[চার / 'শেষসপ্তক']

খেত এখানে বিভিন্ন শস্যের খেত—তা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোন ধারণা বা চেতনার প্রতীক নয়। পল্লীবাঙলার নিসর্গের একটি অপরিহার্য উপাদান নৌকা এখানে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে, 'পুনশ্চ'পূর্ব কাব্যের মতো রূপক বা প্রতীকরূপে নয়। এ পর্যায়ে পথ—নিসর্গের বা শহরের।

উত্তরকাব্যের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় দৃশ্যবর্ণনার প্রাচুর্য, আর এ দৃশ্যপট শুধু প্রকৃতির নয়, প্রকৃতি সম্পর্কিত জীবনেরও বটে। যে মানুষগুলো এ পর্বে ছড়িয়ে আছে তাদের অধিকাংশই গ্রামের এবং তারা কর্মজীবী——বিভিন্ন পেশার সাধারণ মানুষ। তাদের পরিচয়——হাটযাত্রী কুমোর (কোপাই / 'পুনশ্চ'), পাঁচ টাকা বেতনের গুরু (খোঁয়াই/ 'পুনশ্চ'), সদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী (বাঁশি / 'পুনশ্চ'), খবরওআলা (উৎসর্গ / 'শ্যামলী'), ওরাঁও জাতের মালী ও মালিনী (উৎসর্গ / 'শ্যামলী'), চাষী (ঘরছাড়া /'সেজুতি'), জমিদার (বালক / 'পুনশ্চ'), ফেরিওয়ালা (ধ্বনি / 'আকাশ প্রদীপ'), মজুর (ঘরছাড়া / 'সেঁজুতি'), মাল্লা (৪ / 'আরোগ্য') ইত্যাদি।

জীবনের শেষ পর্যায়ে প্রকৃতির তুচ্ছ, সাধারণ উপাদান রবীন্দ্রনাথের কাছে মহার্ঘ্য হয়ে উঠেছে, তাই যখন——

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,
চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়
বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।
[৪ / 'শেষ সপ্তক']

তখন এই তুচ্ছ ও সাধারণ প্রকৃতির মধ্যে তিনি আবহমানকালের প্রাণের প্রবাহটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

উত্তর জীবনে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, পারিবারিক মৃত্যুজনিত শোক, ইউরোপ আমেরিকা——বিশেষতঃ রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কবির দৃষ্টিকে স্বচ্ছতা দিয়েছে। সেই স্বচ্ছ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি প্রকৃতিকে অবলোকন করেছেন বলেই প্রকৃতির যথাযথ চিত্র এ পর্বে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই আলোকোজ্জ্বল রঙীন প্রকৃতি বা তার প্রশান্তি যেমন এখানে আদৃত, তেমনি সমাদৃত অনুজ্জ্বল রঙহীন প্রকৃতির বিবর্ণতা—তার তাণ্ডব বা ভয়াবহতা।

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
[চৌদ্দ / 'জন্মদিনে']

অথবা

বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা
[পুকুরধারে / 'পুনশ্চ']

এখানে উল্লেখ্য যে 'পুনশ্চ' পূর্বকাব্যের প্রকৃতি বর্ণনায় বর্ষা বা বসন্ত প্রাধান্য পেলেও এ পর্বে তার স্থান নিয়েছে শরৎ, শীত বা হেমন্ত। কিন্তু বার্ধক্যের সঙ্গে অর্থাৎ রিক্ততার সঙ্গে এ সব ঋতুর সাযুজ্য থাকলেও এখানে আলোর ঋতু শরৎ উপেক্ষিত নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উত্তর কাব্যে বৈচিত্র্য আছে, রঙের সমারোহ, উপাদানের প্রাচুর্য বা আলোক সেখানে অনুপস্থিত নয়। তবে লক্ষণীয় যে প্রকৃতিকে তিনি যেভাবে অবলোকন করেছেন ঠিক সেভাবেই তুলে ধরেছেন। তাই তা কখনো রঙীন কখনো

রঙহীন। 'পুনশ্চ'—পূর্ববর্তী কাব্যের তুলনায় 'পুনশ্চ'-পরবর্তী কাব্যে কবি অনেক বেশী বাস্তব। এ পর্বে প্রকৃতিকে তিনি আদর্শায়িত করেননি, কল্পনার রঙ এখানে নেই বললেও চলে, অথচ তা তুচ্ছতায় আবিল নয়। শেষ পর্যায়ে বিচিত্র ঘটনা ও বার্ধক্যের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ কবি নির্লিপ্ত নিরাসক্তভাবে প্রকৃতিকে দেখেছেন বলেই প্রাচুর্য ও দীনতা, রঙ ও রঙহীনতার সমাবেশে প্রকৃতির সম্পূর্ণ চিত্রকে তুলে ধরতে পেরেছেন। তাই শরৎ প্রকৃতির বর্ণাঢ্য রূপ যেমন তাকে অভিভূত করেছে তেমনি মাটিকাটা পুকুরের পাড়ে খেজুরের পাতায় খাওয়া মজুরের বাসার ক্ষীণ মিটমিটে আলো, ধানকাটা কাজে চাষীদের সারাদিন ব্যস্ততা—অর্থাৎ প্রকৃতি সংলগ্ন বহমান, চলমান, কর্মময় জীবনও তাকে প্রলুব্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যে প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে উপরোক্ত সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গ্রন্থপঞ্জী

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "জীবনস্মৃতি" ১৩১৯ (১৯১২), রবীন্দ্ররচনাবলী (র-র), সপ্তদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ সং 'রাশিয়ার চিঠি' বৈশাখ ১৩৩৮ (১৯৩১), র-র, বিংশ খণ্ড ঐ 'পুনশ্চ' আশ্বিন ১৩৩৯ (১৯৩২), র-র ষড়বিংশ খণ্ড, ঐ 'শেষসপ্তক', বৈশাখ ১৩৪২ (১৯৩৫), র-র, অষ্টাদশ খণ্ড, ঐ 'বীথিকা' : ভাদ্র, ১৩৪২ (১৯৩৫), র-র ঊনবিংশ খণ্ড, ঐ 'পত্রপুট', বৈশাখ ১৩৪৩ (১৯৩৬), র-র, বিংশ খণ্ড, ঐ 'শ্যামলী' ভাদ্র ১৩৪৩ (১৯৩৬), র-র বিংশ খণ্ড, ঐ 'ছড়ার ছবি', আশ্বিন ১৩৪৪ (১৯৩৭), র-র একবিংশ খণ্ড ঐ, 'প্রান্তিক', পৌষ ১৩৪৪ (১৯৩৮), র-র, দ্বাবিংশ খণ্ড, ঐ 'সেঁজুতি', ভাদ্র ১৩৪৫ (১৯৩৮), র-র দ্বাবিংশ খণ্ড, ঐ 'আকাশ প্রদীপ', বৈশাখ ১৩৪৬ (১৯৩৯), র-র, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ঐ 'নবজাতক', বৈশাখ ১৩৪৭ (১৯৪০), র-র, চতুর্বিংশ খণ্ড, 'সানাই', শ্রাবণ ১৩৪৭ (১৯৪০), র-র, চতুর্বিংশ খণ্ড, ঐ 'ছেলেবেলা', ভাদ্র ১৩৪৭ (১৯৪০), র-র, ষড়বিংশ খণ্ড, ঐ 'আরোগ্য' ফাল্গুন ১৩৪৭ (১৯৪১), র-র, পঞ্চবিংশ খণ্ড, ঐ।